

প্রান্তিকতা গ্রন্থমালা — ৩

মারাং-এর পৃথিবী

একটি সাঁওতাল জীবনকথা

বড়ো বাস্কে



অনুস্তুপ প্রকাশনী

২ই, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯

মুখবন্ধ

অনুষ্ঠাপ প্রকাশিত প্রান্তিকতা গ্রন্থমালার তৃতীয় বই *মারাং-এর পৃথিবী*। এই বই একদিকে একটি যাত্রার কাহিনি, আবার অন্যদিকে এটি নিজেই একটি যাত্রার সূচনা। দ্বিতীয় দিকটি নিয়ে একটু পরে ফিরে আসব।

শুরু করা যাক যাত্রার কাহিনি দিয়ে, যে কাহিনি দেশান্তরের, স্মৃতির, পরিচিতির—একজন মানুষের কণ্ঠস্বরে উঠে আসা মানবসমাজের এক গোষ্ঠীর অস্তিত্বের। এখানে এমন এক পৃথিবী উন্মোচিত হয় যা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং সামূহিক। একই সঙ্গে একক মানুষের একান্ত আখ্যান আবার বহু মানুষের সম্মিলিত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন। স্মৃতি হয়ে ওঠে ইতিহাস। সেই ইতিহাসের বড় অংশ কোনো দপ্তরের নথিতে লেখা নেই—তা টিকে আছে সঙ্গীতে, কাহিনিতে, বংশপরম্পরায় প্রতিদিনের জীবনযাপনের গতিময়তায়।

সাঁওতাল পরগনার অরণ্য থেকে বীরভূমের সমতল। সেখান থেকে আরও দূরের পথে এক অদৃশ্য সেতু। সেই সেতুর ওপর দিয়ে হাঁটে এই বই। এই হাঁটা কদাপি সরল নয়—কখনো থেমে যায়, কখনো ঘুরে যায়, কখনো আবার ফিরে তাকায়। কিন্তু থামার উপায় নেই: এই কাহিনির ভিতরেই আছে এক সমাজের দীর্ঘস্থায়ী সহিষ্ণুতা—বারবার ভেঙে পড়েও আবার গড়ে ওঠার ক্ষমতা।

প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই আমাদের সামনে উঠে আসে এক উষাকাল। যে মুহূর্তে অন্ধকারভেদী সূর্যালোকে পৃথিবী নিজেকে জাগ্রত করেছে, কর্মময় জীবনের মহিমায়, সেই মুহূর্তে সাঁওতাল জনসমাজের এক পরিবারের জীবনে নেমে আসছে আপন গৃহের শেষ সন্ধ্যা। তারা গোছগাছ সেরে প্রস্তুতি নিচ্ছে, ভিন্নত্র কোনো বাসার খোঁজে। চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। শিশুদের চোখে অকাল-জাগরণের অতৃপ্ত ও বিরাগ। তাড়াহুড়োয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে বড়রা, আর কথার ফাঁকে ফাঁকে জমে উঠছে এক অদৃশ্য ভার। এই দৃশ্যটি

যেন খুব পরিচিত—কিন্তু তার ভেতরে লুকিয়ে আছে এক গভীর বিচ্ছেদ। এখানে শুধু ঘর ছেড়ে যাওয়া নয়, এখানে ফেলে আসা হচ্ছে সম্পর্ক, স্মৃতি, আর সেই অদৃশ্য টান, যাকে আমরা বলি ‘আপন ঘর’—স্বদেশ।

এই আপাত সামান্য দৃশ্যটি, কার্যত, আমাদের সামনে তুলে ধরে বৃহত্তর এক ইতিহাসের দরজা। সাঁওতাল সমাজের ইতিহাসে দেশান্তর কোনো বিরল ঘটনা নয়—বরং এ যেন তাদের নিয়তি, এক চাপিয়ে দেওয়া পারম্পরিক অভ্যাস, পুনরাবৃত্ত অভিজ্ঞতা। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে, একাত্মীয়তাবোধে যেমন গড়ে ওঠে মানবসমাজ, তেমনি আবার মানুষের ওপর মানুষের বিধ্বংসী আঘাতে সমাজ বয়ে চলে অমানবিকতার ক্ষতচিহ্ন। সাঁওতাল যেন সেই মানবিক অভিশাপের শিকার। শান্তি তার প্রাণসম্পদ। সেই সুযোগ নেয় ক্ষমতাগোষ্ঠীগুলো। বারংবার তাকে উৎখাত করে বারংবার গড়ে তোলা স্বভূমি থেকে—কঁয়ড়া, কান্দাহারি থেকে নিয়ে চাই চম্পাগড় হয়ে সে একদা সাঁওতাল পরগনাতে গড়ে তুলল নিজের ঘর। সেই ঘরও তার থাকল না, দখল হয়ে গেল, আর সাঁওতালকে ভেসে বেড়াতে হল, বীরভূম থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে আসাম পর্যন্ত নানা ভূমিতে—সে কেবল তার দেশই হারাল না, হারাল স্বজন, সমূহ, সমাজ। হারানোর মধ্য দিয়ে সে নতুন করে পেতে চায়। এই বই সেই হারানোর ও পাওয়ার এক মরমি বিবরণ, যা সাঁওতালের সেই পথ চলাকে ভেতর থেকে অনুভব করে—মানুষের চোখে, কণ্ঠে, আর স্মৃতিতে।

মারাং বাস্কের কণ্ঠে আমরা যে গল্প শুনি, তা কেবল তাঁর নিজের নয়। তাঁর ঠাকুরদা জেঠা বাস্কে, তাঁর আগের প্রজন্ম—সবাই মিলে যেন এক বহমান কণ্ঠস্রোত তৈরি করেছে। এই স্মৃতিগুলি সরল রেখায় সাজানো নয়; বরং তারা ভাঙাচোরা, কখনো গল্পের মতো, কখনো লোককথার মতো। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তারা সত্যের ঘনিষ্ঠ। জীবনের সত্য তো একরৈখিক নয়—তা সবসময়ই বহুস্তরীয়, তরুছায়াবৃত, সূর্যালোকে ধীমান, চন্দ্রাতপে স্নেহোন্মাদ।

ইতিহাস ও নৃত্বের আলোচনায় এই পথ চলার কথা বহুবার এসেছে, কিন্তু এসেছে এক অনাথ শিশুর মতো—যেন এই তার ভবিষ্যৎ, বড়জোর তাকে খেতে-পরতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখাটাই বদান্যতা। বিপরীতে, এই বই তাকে স্নেহে, মমতায় কোলে তুলে নেয়, তাকে আশ্রয় দেয় নিজের বুকের গভীরে। এখানে আমরা দেখি, দেশান্তর কেবল একটি ঘটনা নয়—এটি একটি অনুভূতি, একটি স্মৃতি, একটি বয়ে চলা অভিজ্ঞতা।

এই অভিজ্ঞতার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকাশ ঘটে সংগীতে। বই জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গানগুলি যেন এক চলমান স্মৃতিশালা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বেদনা—এগুলো শুধু শব্দমাত্র নয়, তারা এক ইতিহাসের ভাষা। “সোনার ঘর” ফেলে আসার যে পুনরাবৃত্তি, তা কেবল কাব্যিক নয়—তা এক গভীর মানসিক আঘাতের প্রতিধ্বনি। আবার সেই ধ্বনি ও ছন্দে ফিরে আসে নতুন জায়গায় বাঁচার জেদ, নতুন করে এই ধরিত্রীকে ফিরে পাবার সাহস।

এতবার স্থান বদল করার পরেও সাঁওতাল নিজেকে হারায়নি—হারায়নি ভাষা, উৎসব, সামাজিক নিয়ম, সংগীত। পৃথিবীর নানা রহস্যের মধ্যে এও এক বিরাট রহস্য—কী সেই শক্তি, কী সেই প্রেরণা, আর কী সেই প্রাকৃতিক-মানবিক সংযোগ যা তাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে? আজ বিশ্ববিদরা, প্রকৃতি ও পরিবেশবিদরা মাতা ধরিত্রীর যে বিপন্নতা, জীবজগৎ-জড়জগতের বিলুপ্তির যে আশঙ্কার বিষয়ে আমাদের সচেতন করার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, “মারাং-এর পৃথিবী”-র বিশ্বভাবনা সেই বিপদ হতে রক্ষা করার কিছু হদিশ দিতে পারে। সাঁওতালের—এবং তার মতো পৃথিবীর আদি-বাসিন্দাদের ওপর বারংবার নেমে আসা আঘাত সয়েও সে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখে নিজের অস্তিত্ব—নিজের পরিচিতি?

এই পরিচিতি কোনো স্থির বস্তু নয়। এটি বদলায়, মানিয়ে নেয়, নতুন কিছু গ্রহণ করে। নতুন জায়গায় গিয়ে সে নতুন পরিবেশের, অর্থব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থার সম্মুখীন হয়। বদলে যায় জীবিকার ধরন, সমাজের কাঠামোতেও আসে নানা পরিবর্তন: একটা স্বনির্ভর জীবিকা-ব্যবস্থা বদলে যায় মজুরিনির্ভর অর্থতন্ত্রে। এই পরিবর্তন শুধু আর্থনীতিক নয়, এটি এক গভীর সামাজিক রূপান্তর।

অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগও এই পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভাষায়, পোশাকে, আচার-অনুষ্ঠানে এক ধরনের মিশ্রণ তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই মিশ্রণ মানেই বিলুপ্তি নয়—বরং এটি এক নতুন রূপে টিকে থাকার উপায়।

এই বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, সাঁওতালকে এটি কদাচ বিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখায় না, সে চিরকাল অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থেকেছে। কামার, কুমার, তাঁতি—এইসব পেশাজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক দীর্ঘকালের, গভীর সৌহার্দের। কেউ তার কাকা, কেউ ভাগনে, কেউ খুড়িমা, কেউ বোনপো—রক্তসম্পর্ক ব্যতিরেকেই গড়ে ওঠা কৃত্রিম আত্মীয়তা সম্পর্কগুলোই

লেখকের কথা

ছোটবেলায় পাঠশালাতে পাশের গ্রামের কালো মাস্টার আমাদের প্রায়ই বলতেন, ‘শুন, মানুষ যদি হতে চাস তাহলে নিজেদের ভাষায় কথা বলা চলবে না, বাংলায় বল। মুরুক দিয়ে—মন দিয়ে—পড়াশুনা কর কেউ সাঁওতাল থাকবি না, সবাইকে দিকু বানিয়ে ছাড়বা।’ মাস্টারমশাইয়ের সেই কথাগুলি ইন্সকুলজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মস্তের মতো আমার কানে বাজত। নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে নিজেকে মূলধারার সমাজের মধ্যে মিশিয়ে দেবার কী ব্যাকুল প্রচেষ্টাই না থাকত তখন আমার মধ্যে। না, আমার সহপাঠীরা কেউ দিকু হতে পারিনি। বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোনোর আগেই কবে যে মতুয়া ফুলের মতো সবাই ঝরে গেল আমরা কেউ টের পেলাম না। আমি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় চাকুরি করে ব্যক্তিগত জীবনে যে সাফল্য অর্জন করেছি তার সামাজিক মূল্য এখন অনেক। তৎসত্ত্বেও নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবহেলার প্রতিদানে যে সামাজিক সাফল্য আমি অর্জন করেছি তা যেন বড্ড ফাঁপা মনে হয়। একজন আদিবাসী কেন নিজের ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতির জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়েই আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না! শিশুর মাতৃভাষা, তার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ কেড়ে নিতে পারার মধ্যেই কি বিদ্যালয় শিক্ষার সাফল্য? শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি এই নৈতিক ও বাস্তব প্রশ্নের জায়গা থেকেই আমার এই বই লেখার ভাবনা।

মারাং একটি সাঁওতাল ছেলে যার পূর্বজ ছিল বিদ্রোহের পাঁচ দশক পরে সুদূর সাঁওতাল পরগনা থেকে খাদ্যের সন্ধানে দেশান্তরি হয়ে বীরভূম জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে ডেরা বাঁধে। মারাং সেই পরিবারের চতুর্থ প্রজন্ম। নিজের মধ্যে পূর্বজদের বয়ে আনা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং এ-দেশে শিক্ষার মধ্য দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া সাংস্কৃতিক সংঘাতের মাঝে কীভাবে একটি অসহায় বালক নিজের ছোট জগৎকে খুঁজে চলেছে, এই বইতে সেই সংগ্রামের কাহিনিই বর্ণনা করা হয়েছে।

অনেক আদিবাসী লেখকদের মতোই আমার লেখাও শুরু হয় সাঁওতালি ভাষায় শিশুদের জন্য গান ও ছড়া লেখার মধ্য দিয়ে। পরে ছোট পত্রিকায়

সমসাময়িক বিষয়ের উপর লেখা শুরু করি। আদিবাসীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয় নিয়ে আনন্দমেলা, আরেকরকম ও আনন্দবাজারের মতো পত্রিকাতেও লিখেছি। একদিন বিকেলে শান্তিনিকেতনে সুবোধদার চায়ের দোকানে বসে কুমারদা (কুমার রাণা) আমাকে বললেন, ভাই, তোমার এখন একটা বই লেখা উচিত, এখন না লিখলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তারপর থেকেই একটি সম্পূর্ণ বই লেখার মানসিক প্রস্তুতি শুরু করি। ‘মারাং-এর পৃথিবী’ সেই প্রস্তুতির ফল।

যে-সকল প্রিয়জন আমাকে এই লেখার কাজে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে জার্মান লেখক ও রবীন্দ্র গবেষক ড. মার্টিন কেম্পচেন অন্যতম। দীর্ঘদিন তাঁর সংস্পর্শে থেকে সাঁওতাল জগতের বাইরেও যে বৃহত্তর জগৎ আছে সেটা চেনার অবকাশ করে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক অধ্যাপিকা কুমকুম ভট্টাচার্য ও সাঁওতাল জীবন ও সংস্কৃতির উপর আমার আলোচনার সঙ্গী অধ্যাপক রঞ্জিত কুমার ভট্টাচার্য; দীর্ঘ দিনের কাজের সাথি গোকুল হাঁসদা, সোনা মুরমু, স্নেহাদ্রি শেখর চক্রবর্তী, সন্ন্যাসী লোহার ও বিষ্ণুবাটি ও ঘোষালডাঙা গ্রামের বাসিন্দা যাঁদের সহযোগিতায় গ্রামে একটি বিধিমুক্ত সাঁওতাল বিদ্যালয় ও সাঁওতাল সংস্কৃতি সংগ্রহালয় স্থাপন করতে পেরেছি।

বিভিন্ন কাহিনি, গান ও তথ্য দিয়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সুন্দর মনোজ হেমরম, সাঁওতাল পরগনা; ড. সন্তোষ বেসরা, জামতাড়া; চেরে সরেন, গিরিডি; প্রেমচাঁদ মুরমু, চক্রধরপুর; মহাদেব হাঁসদা, বাঁকুড়া; সারদা প্রসাদ কিস্কু (খেলওয়াড় বাসিয়া); রাজকিশোর মারাভি, আসাম; নিশির সরেন, বাংলাদেশ; বিষ্ণুবাটি গ্রামের বিমল বাস্কে ও মংলা বাস্কে। সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বন্ধু ও সহকর্মী সন্ন্যাসী লোহার বইটির জন্য ছবি ঐকে দিয়েছেন। কুমারদা বরাবর আমার উৎসাহদাতা। ঐদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সীমায় আটকে থাকার নয়।

অনুষ্ঠাপ প্রকাশনী আগেও তাঁদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন, এবারেও এই বই প্রকাশ করে আমাকে ঋণী করে রাখলেন।

আমার মা ও বাবা, দুই কন্যা ইপিল ও আরিল এবং স্ত্রী আশা আমার জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে আছেন। সুতরাং এই বইতে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে আলাদা করে আর কী-ই বা বলি?

বড়ো বাস্কে

সূচি

ভুরকুন্ডা থেকে বীরভূম	১৭
পূর্বজন্দের কথা	২৯
আমাদের গ্রাম	৫২
মাঝিঁ ঘাঁরঞ্জ	৬১
আমাদের গ্রাম তৈরির কথা	৭১
নকশালের দিন	৮৬
শুয়োর চরানোর দিন	৯৩
সং মা	১০০
গ্রামের পাঠশালা	১১০
মিশনারি ইশকুল	১১৯
বরযাত্রী	১৩১
ভাটা কামি	১৪৭
রেন্টা কাকা	১৫২
গগ	১৬০
ইস্কুল থেকে নিখোঁজ	১৬৮
আমার মাসি	১৭৬
আটান্তরের বান	১৮২
ডুব সারেচ্	১৮৮
ঘরে ফেরার কাহিনি	১৯৬
সংঘাত	২০৩
ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই	২০৯

ভুরকুন্ডা থেকে বীরভূম

ঠাকুরদা জেঠা বন্ধের কাছ থেকে শোনা কথাগুলো দিয়ে শুরু করি।

তখনও অন্ধকার। আমি আর ছিতা ঘরের পিঁড়েতে তালাইয়ের উপর কেঁতা পেতে ঘুমোচ্ছি। বাবা সামনের চালাঘর থেকে উঠোনে এসে মায়ের উদ্দেশ্যে ডাক দিয়ে বললেন, “এখনো ঘুমোচ্ছ? ওঠো, এখনই মোরগ ডাকবে।”

মা জেগেই শুয়ে ছিলেন। বাবা সেটা বুঝতে পেরে আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ির পাশের গলি দিয়ে পেছনের বাঁশবনের দিকে বেরিয়ে গেলেন। মা বিছানা থেকে উঠে নিজের আঁচলে জড়ানো ছিতার পা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে, ঘুমের ঘোরে ভিতের দিকে গড়িয়ে যাওয়া শরীরটা চাটাইয়ের উপর টেনে তুলে একটা চাদর দিয়ে আমাকে আর বোনকে ঢাকা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মা প্রতিদিন সকালে বাড়িতে সবার আগে উঠে বাড়ির কাজে হাত দেন। কিন্তু আজ মনে হয় তাঁর শরীর সইছিল না। গতকাল সন্ধ্যায় ঠাকুরমা, ঠাকুরদা, কাকারা উঠোনে বসে হাঁড়িয়া খেতে খেতে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করেছেন। তারপর গোছগাছ করে ঘুমোতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। উঠোনে রাখা কলসির জলে হাত-মুখ ধুয়ে মা রোজকার মতো ঘরের চালে গোঁজা শাল কাঠির দাঁতন মুখে নিয়ে একমনে উঠোন বাঁট দিতে লাগলেন।

বাড়ির পেছন থেকে ফিরে এসে বাবা আমাদের ঘুমোতে দেখে নীচু গলায় বললেন,

“কী রে জেঠা এখনো ঘুমোচ্ছিস? ওঠ ওঠ।”

তারপর ছিতার হাত হালকা করে টেনে বললেন, “ছিতা, ওঠ মা, আজ যেতে হবে যো।”